আত্মারামের হোলি

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

ঋতুশ্রেষ্ঠ বসন্তকাল। এই বসন্তকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উৎসব পালিত হয়। বসন্তে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যের এক অদ্ভুত সাম্যভাব পরিলক্ষিত হয়। এইকালে শীত ও গ্রীষ্ম অথবা শীতলতা ও উষ্মতার সমরস্যতা হয়, ঠিক যেমন সাধকযোগীর অভ্যন্তরে অগ্নির তেজ ও স্নিগ্ধ শীতল চান্দ্রীসুধার সম্মিলন হয়। আধারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পূর্ণজাগরণ হলে দেহাভ্যন্তরে যোগীগণ বেশ উষ্মতা অনুভব করে থাকেন। এই উষ্মতাভাবের অবসান হয় তখনি যখন মস্তকে সহস্রারস্থিত চান্দ্রীসুধা যোগীর মধ্যে অবিরত অবতরণ করতে থাকে এবং নাভিচক্রের অগ্নিকে শীতল করে দেয়; যার ফলে যোগীগণের দেহ হয় অমৃতময়। এ অবস্থা প্রাপ্ত হলে যোগীগণ প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়ে যান। তখন হৃদয়ে প্রাণের গতি স্থির হয়। হৃদয়ে প্রাণের স্থিরত্বে যোগী 'কেবল' অবস্থালাভপূর্বক আত্মারামকে দর্শন ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। অর্থাৎ, যোগীর চেতনা তখন চৈতন্য সাগরে ছড়িয়ে পড়ে। চেতনা হতে চৈতন্যসাগরে অবগাহন করে ব্রহ্মানন্দের হিল্লোলের স্পর্শে যোগী হৃদয়েও হিল্লোল জাগে। সে অবস্থায় সুরত-যোগী মহাত্মা কবীর সাহেব উপনীত হয়ে তাই বলেছেন—"হোরী খেলৈঁ সন্ত সুজান, আতম রাম সোঁ ॥

মহাত্মা কবীর

ঘরি ঘরি পলপল ছিন ছিন খেলৈঁ, নিসদিন আঠোঁ জাম॥
যোগী খেলৈঁ যোগ ধ্যানমেঁ, দুনিয়াঁ ভূত পখান।
পণ্ডিত খেলৈঁ চার বেদসে, মুলনা কিতাব কুরান ॥
পতিবরতা খেলৈঁ অপনে পিয়া সঙ্গ, বেশ্যা সকল জহান।
মহা প্রচণ্ড তেজ মায়াকো, সব জগ মারা বান ॥
কামী খেলৈঁ কামিনিকে সঙ্গ, লোভী খেলৈঁ দাম।
সাহব কবীর খেলে সন্তনসোঁ, ঔর ন কাহূ কাম ॥"—

অর্থাৎ, আত্মারামের সঙ্গে সন্তসুজনেরা নিশিদিন অষ্টপ্রহর ধরে প্রতি ঘন্টায় প্রতি পলে পলে হোলি খেলেন। এ ভৌতিক জগতে সবাই কোন না কোনও প্রকারে হোলি খেলে চলেছেন—যেমন—যোগীগণ যোগধ্যানের মধ্যে খেলেন। পণ্ডিতগণ চার বেদের সঙ্গে খেলেন এবং মৌলবীগণ কোরান গ্রন্থের সঙ্গে খেলেন। আবার, পতিব্রতা রমণী খেলেন তার প্রিয়সঙ্গে, বেশ্যা খেলে সমাজের সঙ্গে, তাই কবীর সাহেব বলছেন, মায়ার এমনই মহা প্রচণ্ড তেজ যে সর্বত্র বাণ মেরে রেখেছে। কামী কামিনীর সঙ্গে হোলি খেলে এবং লোভী তার লোভ রিপুর সঙ্গে খেলে কিন্তু মহাত্মা কবীর নিষ্কামভাবে সন্তগণের সঙ্গে হোলি খেলেন আত্মারামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। আত্মসত্তার বক্ষে সচ্চিদানন্দের স্পর্শের হিল্লোলই "হোলি"।

সাধক অনেক প্রকার সাধনার সহায়তায় কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে পারে। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হলে পরে সাধকের অন্তরে ঘটাকাশে যে স্ফোট হয় তাকেই নাদ বলে। নাদ হতে জ্যোতির স্ফুরণ হয়। জ্যোতির ব্যক্তরূপ মহাবিন্দু এবং এই মহাবিন্দুরও তিনটি রূপ—যেমন ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া। এদের প্রতীকাত্মক ভাষায় সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি তথা ব্রহ্মা (অগ্নি), বিষ্ণু (সূর্য্য), শিব (চন্দ্র) বলা হয়। ঐ প্রকার নাদেরও আবার তিনটি রূপ আছে—মহানাদ, নাদান্ত আর নিরোধনী। জীব সৃষ্টিতে যে নাদ উৎপন্ন হয়, তা হল ওঙ্কার। এই ওঙ্কারকেই শব্দব্রহ্ম বলা হয়। দেহাভ্যন্তরস্থ ষট্‌চক্রাদি ভেদন করত যোগী সহস্রারের শ্রী বিন্দুতে ভ্রামরীগুহায় অবস্থান করে পরাসম্বিৎময় অমৃত পান করতে সক্ষম হন। তখন যোগীর মধ্যে সংকল্প-বিকল্প ভাব তিরোহিত হয়ে যোগী সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হন। সহজাবস্থায় অমৃতের পরশে হৃদয় কমলের সঙ্গে চেতনা সংযুক্ত হলে পরে যোগী-হৃদয়ে প্রেমপূর্ণ সৌন্দর্য্যবোধ সামঞ্জস্যতা লাভ করে। তখন আত্মানন্দের হিন্দোল হৃদয়ে অনুভব করে যোগীসাধক অজপা জপের ছন্দে বিভোর হয়ে থাকেন। এ বিষয়টি মহাত্মা কবীর সাহেব "রাম নামের রসায়ন পান করা" বলেছেন—"কোঈ পীবে রস রাম নাম কা জো পীবে সো যোগী রে, সতী সেবা করো রাম কী আউর ন দুজা ভোগী রে। য়হু রস তো সব ফীকা ভয়া ব্রহ্ম অগ্নি পর জাবী রে। ঈশ্বর গৌরী পীবন লাগে রাম তনী মতবালী রে ॥ চন্দ্রসূরে দোঈ ভাটী কীন্হীঁ সুখমনি চিগবা লাগীরে। অমৃত কো পী সাঁচা পুরয়া মেরী তৃষ্ণা ভাগী রে ॥ য়হ রস পীবে

গুঙ্গা মহিলা তাকি কোঈ ন বুঝে সার রে। কহৈ কবীর তহা রস মন্হগা কো জোগীয়া জীবণ হার রে ॥ —অর্থাৎ, চন্দ্র আর সূর্য্যের মধ্যস্থলে সুষুম্নায় চিতি শক্তির সহায়তায় রাম রসায়নের উৎপত্তি। সাচ্চা যোগীগণ এই রাম-রসায়ন পান করে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন। ঈশ্বর আর গৌরীও এই রাম নামের রসায়ন পান করে আনন্দে নিমগ্ন থাকেন। এই রাম নামের রসায়ন বটীকা খুবই অমূল্য সম্পদ। এই রস সেই পান করতে পারে যে নিজের সব কিছু ত্যাগ করতে পারে। রাম-রসায়ন রূপ প্রেমের পেয়ালা পান করলে কুণ্ডলিনী স্বয়ং জাগ্রত হয়ে ওঠে। মহাত্মা কবীর এই রাম-রসায়ন রস পান করে নেশায় বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন। সে অবস্থায় উপনীত হয়ে কবীর সাহেব বললেন—

''হিণ্ডোলনা তহ ঝুলৈ আতম রাম
প্রেম ভগতি হিণ্ডোলনা সব সন্তন কো বিশ্রাম,
চন্দ সুর দুই খম্ভবা বঙ্কনালি কী ডোরি।
ঝুলে পঞ্চ পিয়ারিয়াঁ তহ ঝুলৈ জীয় মোর ॥''

—অর্থাৎ, সে স্থলে দোলনায় দুলছেন আত্মারাম স্বয়ং; সেটি প্রেম-ভক্তির দোলনা, সব সন্ত মহাত্মনেরা তথায় বিশ্রাম করেন। সেখানে চন্দ্র-সূর্য দুই স্তম্ভ মধ্যে বঙ্কনালীর দড়ি থাকে, তারই মধ্যে পঞ্চতত্ত্বরূপ প্রকটিত রহে এবং তথায় মহাত্মা কবীরের নিজ অস্তিত্ববোধও দোদুল্যমান রহে। উপলব্ধির আসনে 'হিলন বা ঝুলন' তথা 'দোলন বা দোল' একই ব্রহ্মানন্দের রস বিশেষ। এস্থলে মহাত্মা কবীর প্রেম এবং যোগকে একরস করেছেন দোলন বা দোল বা ঝুলন তত্ত্বের মাধ্যমে।

আত্মদ্রষ্টা সত্যদ্রষ্টা সিদ্ধযোগীগণ আত্মানন্দের মধ্যেই সচ্চিদানন্দের পরমানন্দকে উপলব্ধি করে নিত্য হোলি খেলেন নিজ অভ্যন্তরে তাই কবীর সাহেব বলছেন—

''নিত মঙ্গল হোরী খেলিয়ে হো।
অহো মেরে সন্তো নিতহী বসন্ত নিত ফাগ ॥
দয়া ধরম কী কেশর ঘোরো। প্রেম প্রীতি পিচকারী ॥
ভাব ভগত সোঁ ভরি সতগুরুকো। সুফল জনম নরনারী ॥
ছিমা অবীর চরচ চিত চন্দন। সুমরন ধ্যান ধমারি ॥
জ্ঞান গুলাল অগর কস্তূরী। উমঙ্গি উমঙ্গি রঙ্গ ডারি ॥
চরণামৃত প্রসাদ চরণরজ। অপনে শীশ চঢ়ায়।
লোক লাজ কুল কানি মেটিকে। নির্ভয় নিশান বজায় ॥
কথা কীর্ত্তন মগ্ন মহোছব। করি সন্তন কী ভীর ॥
কবহূঁ না কাজ বিগড় হৈ তেরো। সত সত কহৈঁ কবীর ॥''

—অর্থাৎ, ওহে আমার সন্তগণ! তোমরা নিত্যই মঙ্গলময় হোলি খেলো, যাতে তোমাদের নিত্যই বসন্ত ও নিত্যই ফাগ উৎসব হয়। তোমরা দয়া ধর্মের কেশর রঙ গুলে প্রেম-প্রীতি রূপ পিচকারীতে ভরো, এবং সদ্গুরুপ্রদত্ত ভক্তিভাবের সহায়তায় মনুষ্য জনমকে সফল করো। ক্ষমাভাবের আবীরে এবং চন্দনে চর্চিত হয়ে সর্বদা স্মরণ এবং ধ্যানের সঙ্গীতে রত থাকো; যার ফলে লোহিত আবীরের রঙে জ্ঞান এবং সুগন্ধিত কস্তুরীর সুবাস ধ্যানাকাশে নবনব রূপে রঙে প্রকাশিত হয়। তোমরা সদ্গুরুর চরণামৃতরূপ প্রসাদ এবং চরণরজ নিজ মস্তকে ধারণ করে লোক সমাজে লাজলজ্জা কুলের মান সর্বস্ব পরত্যাগ করে নির্ভয়ে সত্যের বিজয় পতাকারূপ নিশাণ বাজাও সৎকথা, কীর্ত্তনে মহোৎসবে মগ্ন হয়ে সন্তগণের আসরে। কবীর সাহেব বলছেন, ''আমি সত্য সত্য বলছি, এইরূপ ঈশ্বরীয় সৎবৃত্তিতে থাকলে কোনদিন তোমাদের লক্ষ্য বা কর্ম ব্যর্থ হবে না।''

যেখানে যোগীগণ নিত্য বসন্তোৎসবে মেতেছেন সেখানে নাই কোন দ্বন্দ্ব, নেই কোন উপাধি, নেই কোন দৈন্য। সেখানে সবই সহজ অবস্থাপ্রাপ্ত। সেই অনাবিল প্রেমের রাজ্যে প্রবিষ্ট হলে যোগীগণ সহজযোগে উপনীত হয়ে শ্রীপুরুষোত্তমের রাসমণ্ডলের নিত্যলীলার দর্শন ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। দিব্যভাবে বিভোরা কবীর সাহেব প্রেমসিক্ত হৃদয়ে নিত্যরাসকে অনুভব করে পরমাত্মার হোলি বা হোরিতত্ত্বের মর্মকে হৃদয়ঙ্গম্ করেছিলেন। পরম উপলব্ধিত সত্যের আসনে স্থির অটল অবস্থায় উপবেশন করে মহাত্মা কবীর সাহেব হোরি খেলার মহাভাবময় যৌগিকতত্ত্ব সাধক যোগীগণের নিকট এইভাবে ব্যক্ত করলেন—

''হোরী হোরী রঙ্গ বোরী বিরহা ঝকোরি মারী
চৌবা চাল অরগজা রহনী করনী কেসর ঘোরি।
প্রেম প্রীতি সোঁ ভরি পিচকারী রূঁম্রূঁম্ রঙ্গী সারী হমারী ॥
বাজত তাল মৃদঙ্গ বিনা কর বীণা শব্দ রসালী ॥
খেলত হৈ কোই সুঘর খেলৈয়া যোগ জুগতি লগি তারী হমারী।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা রাস রচ্যো হৈ সুখমনি বাট বুহারী ॥
সুরতি নিরতি দোউ নাচন লাগী বঢ়্যো রঙ্গ রতি অপারী।
য়া বিধি হোরী খেলি সন্তো যা হোরী দিন থোরী ॥
গুরু কবীর আতম পরমাতম খেলত বহিয়াঁ জোরী ॥''—

অর্থাৎ, মহাভাবে হোরির রঙে হঠাৎ যেন প্রাণের তরঙ্গের এক দমকে সমগ্র আকাশ মণ্ডলে হোরির রঙ ভরিয়ে দিল যোগীর অন্তরাকাশ, চতুরঙ্গ চাল এবং দিব্য সুগন্ধের আবেশে

কেশর রঙের ঘোলা যোগীর ভক্তিরসে বৈরাগ্যভাবের প্রকাশ ঘটাল। তখন যোগী প্রেমপ্রীতি দ্বারা পিচকারী পূর্ণ করলেন এবং নিজের বস্ত্রকে প্রেমপ্রীতির রঙে রাঙিয়ে নিলেন। তারপর অনুভব হল যে সমগ্র গগণ মণ্ডল জুড়ে এক আদিতাল নিয়মিত ছন্দে বাজছে এবং ঐ সঙ্গে মৃদঙ্গও বাজছে আর তার সঙ্গে বিনা হস্তের স্পর্শে বীণাও মধুর সুরে বেজে চলেছে অবিরত। ঐরূপ রসবন্ত হোলি যোগসাধনায় পারদর্শী সিদ্ধযোগীরাই খেলতে পারেন। সিদ্ধযোগীগণের ইহা এক বিশিষ্ট প্রকার যোগ সাধনা। এই যোগ সাধনায় ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নানাড়ীর পথে রাস রচিত হয়, তন্মধ্যে সুষুম্নার পথ হল শ্রেষ্ঠ। সুষুম্না, ইড়া ও পিঙ্গলায় 'সুরতি' ও 'নিরতি' দুই মার্গ ধারা নৃত্য করতে থাকে। সুরতির ধারা অন্তরমুখীন-গতি আর নিরতির ধারা বহির্মুখীন-গতি; তাই অন্তর এবং বাহিরের রতিরূপ প্রেমের খেলা হোলির মাধুর্য্যকে বাড়িয়ে দেয়। এইরূপ বিধিতেই সন্তেরা হোলি খেলেন আপন আত্মবোধে যুক্ত হয়ে। অথবা, বহিরঙ্গে হোলির সময় কম হয়! গুরু কবীর আত্মা-পরমাত্মার সঙ্গে হোলি খেলেন সম্মিলিত হয়ে।

সন্ত কবীরের রচনাগুলিতে জীবন-মুক্ত আর বিদেহ-মুক্ত এই দুই প্রকারের সাধকযোগীর বর্ণনা পাওয়া যায়। জীবন-মুক্ত যোগীগণ কাম, ক্রোধ এবং বিষয় তৃষ্ণাদি থেকে সর্বদা মুক্ত রহেন। তাঁদের মনে সদৈব প্রসন্নতা অবলম্বন করেন এবং তাঁরা সত্যে অবিচল রহেন। কখনো অপরের নিন্দা করেন না। সর্বদা শ্রীভগবত চরণে তাঁদের অনুরক্তি প্রকাশ পায়। জীবন-মুক্ত সাধকযোগীর শীতল হৃদয়, সমদর্শী, ধীরত্ব এবং সন্তোষভাব সদাই পরিলক্ষিত হয়। জীবন-মুক্তেরা সংসারের আশা পর্য্যন্ত করেন না; তাঁদের অহংকার নষ্ট হয়ে যায় এবং স্বভাবে কোনও বিকার দেখা যায় না। তাঁরা অত্যন্ত দয়ালু, বিনম্র এবং নিরভিমানী হয়ে যান। এমন জীবন-মুক্ত সাধকই রামরসামৃত আস্বাদন করে আনন্দে জীবনযাপন করেন, একথা কবীর সহেব বলেছেন। অন্যদিকে বিদেহমুক্ত ভক্তগণ ''রামরঙ্গি সদা মতবালে কায়া হোয় নিকায়া'' —এইরূপ স্বভাবযুক্ত হন। বিদেহ-মুক্ত মহাত্মাগণের সর্বদাই উন্মনী অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। মহাত্মা কবীর সাহেব জীবনমুক্ত ও বিদেহ-মুক্ত পুরুষ ছিলেন। তাঁর প্রতি জানাই আমাদের হৃদয়ের ভক্তি বিনম্র শ্রদ্ধা।—

''ঐসে খেলত ফাগ বসন্ত, নিরঞ্জন সহজ সুন্ন মেঁ হোরী ॥
বাজত তাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝ ডফ, অগম নিগম কী ডোরী।
মন এক ভঁবর কোকিলা গুঞ্জে, সোহং সোহং সোরী ॥
অষ্টকমল দল ভীতর মনুবাঁ, ত্রিকুটী মহল রচোরী।
কোটি ভানু জগমগ উজিয়ারো, জহঁ মনুবাঁ বিলমোরী ॥''

আত্ম জিজ্ঞাসা

আমি কে? কে আমি?
কাকে আমি বলে ব্যক্ত করছি
সেই আমিই কি আমার
সকল কার্য্যকর্মের স্বামী?
এই দেহকেই, আমি বলে মানি
দেহ মধ্যে প্রাণ-বায়ু
আত্মার যে বাস—
সেই বোধ হয়—
আসল কর্ত্তা আসল স্বামী
তবু এই দেহের প্রভাবে
আমরা সদাই অভিমানি।
সদাই ভাবি আমিই আমার আমি।

এই জীবনে পলে পলে
প্রতি মূহুর্তে ঘটে চলে
ঘাত প্রতিঘাত, শিক্ষা, প্রেম
সফলতা, নিস্ফলতার আত্মগ্লানি
সেকি এই দেহ আমির কর্ম
না সেই পরমাত্মাই তার স্বামী
যার অনুমাত্র অবস্থিতি
দেহকে করে চলেছে সচল অগ্রগামী।
যার ক্ষণ মাত্র অনুপস্থিতি
দেহকে করে দেয় স্থবীর
নিশ্চল তার নেই কোন দামই
হাত নড়ে না পাও চলে না

চক্ষু চির নিদ্রায় নিথর
জীবন যায় থামি।
তাহলে কেন বলি আমি?
কে আমি কেন আমি
এই বোধ হয় প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা
রিপু আর ইন্দ্রিয়ের কর্মতত্ত্ব
যাহা কর্ম প্রবাহে দেহকে করে তুলেছে আমি।
আমি নেই তুমি নেই
সকলই অনিত্য
একমাত্র ঈশ্বর নিত্য
তিনিই জগৎস্বামী
তিনিই আমি তিনিই অন্তর্য্যামি।

—শ্রীমতী সুনন্দা মুখার্জী